মৌসুমী বায়ু বয়ে চলেছে। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড়ো বাতাস অবিরাম গতিতে গাছ গাছালিতে আঘাত হানছে। তার সাথে বৃষ্টি হচ্ছে গুড়ি গুড়ি আবার কখনও বা ঝম ঝম করে। গত দু'সপ্তাহ ধরে ভীষণ গরম পড়েছে। খুব কষ্ট পেয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি জীবেরা। এই মৌসুমী বায়ু সমস্ত জীবের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। শোবার ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একখানা বই পড়ছিলেন হাশিম খান। পার্ল এস বাকের 'মা' পড়তে পড়তে আনমনা হয়ে গেলেন। কি পড়ছেন তা হৃদয়পটে গাঁথতে পারছেন না। কেবলই যেন অতীতে হারিয়ে যাচ্ছেন। বই বন্ধ করে মুখ তুললেন। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ মেঘে ঢেকে রয়েছে। মেঘের সাথে চাঁদ যেন লুকোচুরি খেলছে। মেঘ যখন সরে যাচ্ছে চাঁদ তখন ফিক্ করে হেসে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগন্ত ব্যাপি। তাই বাইরের দৃশ্যটি মনোরমই দেখাচ্ছে। হাশিম খান দেখছেন প্রকৃতি আঁধারের ঘোমটা দিয়ে একবার নিজেকে ঢেকে ফেলছে আবার ক্ষণিক চাঁদের আলোয় নিজের অপূর্ব রূপ বিকশিত করে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ ভাবুককে ভাবিয়ে তোলে, প্রেমিককে করে অসহায়, সংসারীকে দেয় মাধুর্যতা, সংসার বিরাগীকে করে উতলা। যারা এই রূপের সাথে মিতালী করতে পেরেছে তারা হয়েছে চিরস্মরণীয়, আর যারা একে বুঝতে পারেনি তারা হয়রান হয়ে অকারণে ঘুরেছে দিগ্বিদিক। উপভোগ করবার আগেই নিঃশেষ করেছে নিজের আবেগ অনুভূতিকে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হাশিম খান চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেলেন। অতীতের ছেড়া পাতাগুলো যেন জোড়া লেগে আজ তার সামনে রূপালী পর্দার মত ভেসে আসছে একের পর এক।

তার শৈশবের বন্ধু ওয়াজেদ। গরীবের ছেলে অথচ মেধাবী। প্রতিযোগিতায় হাশিম খান কোন সময় ওয়াজেদের সাথে পেরে উঠেননি। তিনি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। অনেক অর্থ ব্যয়ে কয়েকজন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়াতেন তার পিতা। ওয়াজেদের বই কেনার পয়সাই দিতে পারতেন না তার পিতা। বন্ধুদের বই চেয়ে নিয়ে পড়ে শ্রেণীতে প্রথম পদটায় তার নাম থাকতো বরাবর। হাশিম খান তাকে ঘৃণা করতেন না বরং মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করে বন্ধুত্বের প্রতিদান দিতেন। শৈশবের কথা। ওয়াজেদের সাথে একদিন হাশিম খান গিয়েছিলেন তাদের বাড়ী। তার মা নিজের ছেলের মতই তাকে কোলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন- বাবা, তুমি বড় লোকের ছেলে, ওয়াজেদ গরীবের

হ্যাঁ, আপনি উঠবেন না। এখন দু'টো বাজে।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে লাবনী চমকে উঠলো। পাশে দেখে ফৌজি নেই। মুন্নিকে জিজ্ঞেস করলো- ফৌজি কোথায়?

তাকে অনেকক্ষণ আগে আপনার কাছ থেকে নিয়ে গেছি। স্নান করিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। কেন, আপনিতো দেখলেন আমি তাকে নিয়ে গেলাম।

নিজের দুর্বলতার জন্যে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল লাবনী। মুন্নি কিছুটা আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞেস করলো- আপনার শরীর খারাপ হয়েছে আপা?

কই নাতো!

এমনভাবে আপনি তো শুয়ে থাকেন না তাই বলছি।

কেমন যেন মাথা ধরেছে বোধ হল তাই শুয়ে ছিলাম।

ডাক্তারকে কল করবো?

কেন?

না হলে সাহেব বাসায় এসে শুনলে আমাকে বকবে না!

সে ভয় করিসনে, আমি দেখব। তুই তোর কাজে চলে যা, আমি উঠছি।

জড়তা কাটিয়ে লাবনী শয্যা ছেড়ে বাথরুমে যেয়ে ঢুকল।

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে প্রায় সমস্ত দিনই গেল জাপানী ডেলিগেটদের নিয়ে কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে। হাশিম সাহেব যখন বাসায় ফিরলেন তখন রাত দশটা। ফৌজিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে একখানা বই নিয়ে পড়ছিল লাবনী। কিন্তু মন তার সাথে যেন বিদ্রোহ করেছে। বইয়ের মধ্যে এতটুকুও আকৃষ্ট না হয়ে কারও আগমন প্রতীক্ষায় ছট ফট করছিল। বারে বারে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখছিল কত বাজে। দশটা বেজে গেছে। বারটি ঘন্টা সময়ের হিসাব থেকে হারিয়ে গেছে। এখনও তো এলনা, একটা টেলিফোন কলও করলো না। হয়তো শত ব্যস্ততার মধ্যে সময় পায়নি। হঠাৎ গাড়ীর শব্দ শুনে জানালার কাছে ছুটে গেল। ঘিয়ে রঙের দামী টয়োটা গাড়ীটি বারান্দায় প্রবেশ করলো। জানালার পাশে দাড়িয়ে বাইরে দিকে চেয়ে রইল। উপরে উঠে আসবার পদ শব্দ তার কক্ষের দরজার সামনে এসে থেমে গেল। তার বুকটা ধুক ধুক করে উঠলো। প্রবল একটা শিহরন জেগে উঠলো তার দেহ মনে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে যেন আবদ্ধ হয়ে গেছে। পিছনে কক্ষের দিকে ফিরে চাইবে সেই অনুভূতি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

দেখতাম! আগে থেকেই পাড়ার ছেলে মেয়েদের পড়িয়ে কিছু পয়সা আয় করতাম। এবার প্রতিদিন বিকেলে আরও বেশী ছেলে মেয়ে পড়াতে লাগলাম। অনেক ধনী লোকের ছেলে মেয়েরা আসত আমার কাছে পড়তে। বিধাতা আমাদের ভাগ্যের চাকা মনে হয় ঘুরিয়ে দিলেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে খাওয়ার কষ্ট দূর হয়ে গেল, আবার আর্থিক সুবিধাও পাচ্ছিলাম। তখন মাকে ঝিয়ের কাজ করতে নিষেধ করলাম কিন্তু তিনি তা বাদ দিতে চাইলেন না। আমি বললাম- আপনি আমার জন্যে নিজের শরীর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছেন এখন আল্লাহ পাক আমাকে কিছু করবার ক্ষমতা দিয়েছেন, আপনি কেন অবসর নেবেন না? মা বলতেন এই সংসারে এসে পর্যন্ত পরের বাড়ী কাজ করছি এখনও তো শক্তিহীন হয়ে পড়িনি, তবে কাজ ছাড়বো কোন অছিলায়! আমি কাজ ছেড়ে দিলে শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যাবেনা! তোদের নিয়ে আর একদণ্ডও কি এই বাড়ীতে থাকতে পারব! লোকে বলবে ভাড়ানীর এতো দেমাগ কিসের! কি জবাব দেব তাদের! আমি বুঝতাম সবই, কিন্তু মেয়ে হয়ে কি করে মায়ের এতো কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারি। আজকাল যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে সে বয়সের আগেই তিন সন্তানের মা হয়ে তিনি বিধবা হলেন! এ ব্যথা আমাকে অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছিল। অসহায় নারী, নিজের ইচ্ছা মাফিক কিছু করার ক্ষমতা নেই। নিজের মনকে শক্ত করতে থাকলাম। কিন্তু দুষ্টমতি ছেলেদের উৎপাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না। আগে জ্বালাতন করতো মূর্খ ছেলেরা, এখন পিছনে লাগলো লেখা পড়া জানা ছেলেরা। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগলো। আমি একটিও পড়তাম না ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। কিন্তু চিঠির সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। আমি সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আনিস মিয়ার স্মরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার স্কুলের পাঠ শেষ করেছ, আগে যেমন আগলে রাখতে পারতাম এখন তো সে সুযোগ নেই মা। তোমার কোন শক্ত অভিভাবক নেই। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি তো বেশ হয়েছে, নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা তোমাকেই করতে হবে। যুব সমাজ আজ পথ হারিয়ে ফেলেছে। অশোভন কাজ কর্মে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ছে। কখন যে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে সেটাই ভাববার বিষয়। তোমার মঙ্গলের জন্য আমরা সব সময় দোয়া করি। তোমার স্থায়ী বাসের একটা সিদ্ধান্ত তুমি নিয়ে ফেল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে।

সেদিন বাড়ী এসে দেখলাম কয়েকখানা চিঠি আমার ঘরে পড়ে আছে। ইতোপূর্বে কোন দিন একটি চিঠিও খুলিনি, আজ একখানা খুলে পড়বার জন্যে হাতে নিলাম। হাত কেঁপে উঠলো। অজানা

পারলামনা। গুঞ্জন উঠলো চারিদিকে। কানা ঘুসা শুরু হল ভাবীদের মধ্যে। মায়ের কান ভারী করতে লাগলো কেউ কেউ। মা জানেন এতে আমার কোন হাত নেই। হামিদ বড় লোকের ছেলে। সেই এসে আমাকে উত্ত্যক্ত করে তবু তিনি আমাকে মাঝে মাঝে বকা ঝকা করেন। বলে দেন, ওরা এলে আমি যেন সামনে না যাই। মা হামিদকেও বোঝান, তুমি এমনভাবে এসে আমাদের সর্বনাশ করোনা বাবা। সমাজ বড় নির্মম! সত্য মিথ্যা দেখে না। তুমি আর এসোনা বাবা! দোয়া করি আল্লাহ পাক তোমার ভাল করুন। তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফেরৎ পাঠান। একরাশ হতাশা নিয়ে সে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যেত। এ দৃশ্যটি আমার অন্তরে বড় বেদনা জাগিয়ে দিত। একটা বিষয় লক্ষ্য করতাম। কত সমর্থহীন যুবক শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিত, কিন্তু হামিদের সেই শক্তি থাকা সত্ত্বেও অশোভন কিছু করেনি। কোন দিন সে বড় আশা নিয়ে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। অথচ সে ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারত। আমি যখন একা থাকতাম তখন তার ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতো। এতে আমার অন্তর বেদনায় মুচড়ে পড়ত। কেবলই মনে হত আহ! সে যদি আমাদের মত সমাজের ছেলে হত তাহলে কোন দিন তাকে ফেরাতে পারতামনা। মায়ের উপদেশের পর সে আর এলোনা। মনে মনে স্বস্তি পেলেও একটা অজানা আশংকা লেগেই থাকত, নাজানি কখন কি ঘটে যায়। ইতোমধ্যে আমার এস.এস.সি'র রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। মেধা তালিকায় আমি ৪র্থ স্থান পেলাম। আমাকে নিয়ে খুব হুলস্থূল পড়ে গেল। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়ে বিরাট আকারে সম্বর্ধনা দিলেন। অনেক পুরস্কার পেলাম। অনেক আশীর্বাদ, দোয়া, স্নেহ, ভালবাসা পেলাম। সে সাথে কিছু হিংসুটের চোখ রাঙানীও দেখলাম। বেড়ে গেল শুভেচ্ছার আবরণে প্রেম নিবেদন। এমনভাবে অস্থির করে তুলতো যা সহ্য করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। সময় সময় মনে করতাম আত্মহত্যার পথ বেছে নিই। সামনে ভেসে উঠতো মায়ের অসহায় মুখখানি। তখন অসহ্য পীড়ন সহ্য করেও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করত। হঠাৎ একদিন মটর সাইকেল চেপে হামিদ একা এল। আমি তখন বরান্দায় বসে কাঁথা সেলাই করছিলাম। গাড়ী থেকে নেমেই ও সোজাসুজি বারান্দায় উঠে এল। কোন ভূমিকা না করেই বললো, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এলাম। একথা বলেই পকেট থেকে একটা আংটি বের করে খপ করে আমার বাম হাতখানা টেনে ধরে আংটিটা পরিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল। আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে চলে গেল। তার হাতের স্পর্শ পেয়ে প্রবল একটা শিহরন জেগে উঠলো আমার দেহ মনে। মনে হয়

হ্যাঁ, ইউসুফকে লেলিয়ে দিয়েছিস যে এই গভীর রাতে?

তা দেব কেন, সে যদি আমার দোহাই দিয়ে থাকে তাহলে বুঝে নাও কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে তোমার সাথে কথা বলতে। আমাকে ঘুমাতে দাও। রেখে দিলাম। রিসিভার নামিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়ে মুন্নি শুয়ে পড়লো।

সকালে উঠে ফজরের নামায পড়ে ফৌজি আর আদেলকে আদর জানিয়ে কাজের মেয়ে নীলা আর ঝুমুরের কাছে সংসারের খোঁজ খবর নিল। রশিদকে কি কি বাজার করতে হবে তা জানিয়ে খরচ পত্র দিয়ে সে তার মায়ের কাছে যেয়ে বসলো। গত কয়েক দিন প্রচণ্ড কাজের চাপে মায়ের সাথে সময় দিতে পারিনি। তার মা ও মেয়ের কর্ম ব্যস্ততা আর নিপুণতার সাথে বিয়ের কাজ সম্পাদন করতে দেখে নিজেকে সফল মা মনে করে গর্বাবোধ করছিলেন। মেয়ে এ সংসারে কি করে এলো তারপর শিক্ষা দীক্ষা এবং সব কর্তৃত্ব কিভাবে তার হাতে পৌছে গেল সেসব সুখ দুঃখের কথা ইতোপূর্বে তিনি লাবণীর কাছে শুনেছিলেন। তাই মেয়ের কাছে কিছু জানতে চাননি। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার কপালে একটা তৃপ্তির চুম্বন দিয়ে বললেন, পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা তোমার মত একজন লক্ষ্মী মেয়েকে আমার উদরে পাঠিয়ে ছিলেন তার জন্যে তাঁর দরবারে শত কোটি শুকরিয়া জানাই। কত দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে, যা ছিল আমার মত একটা দুর্বল নারীর পক্ষে অসহনীয়। তোমাকে উপলক্ষ্য করে যা পেলাম তা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী। মানুষ স্বপ্ন দেখে আর ভবিষ্যতের জন্য কল্পনার জাল বোনে। আমি কোন দিন এমন অসম্ভব বিষয় নিয়ে স্বপ্ন দেখিনি। যেসব অবিশ্বাস্য বিষয় বাস্তব হয়ে আমার জীবনে প্রতিফলিত হতে চলেছে তা কেবল সেই পরম কুশলী শিল্পীর নিপুণ হস্তের কুদরতি খেলাতেই সম্ভব! অপরিণত বয়সে ঘোমটা টেনে প্রৌঢ় স্বামীর সংসারে এসেছিলাম সেটা যেন আজ মনে হচ্ছে স্বপ্ন। আমি যেমন দেহ মনের দিক থেকে পেয়েছি অপরিমিত শান্তি তেমন একটা বিষয়ে আমি পীড়া অনুভব করছি। সেটা হচ্ছে আমি মস্ত বড় ঋণী নারী। স্রষ্টার ঋণ পরিশোধ করা যায় না। পরিশোধ করতেও হয় না। কিন্তু মানুষের ঋণ নিঃস্বার্থ হলেও পরিশোধ করতে না পারলে মনের গহীনে অস্বস্তিবোধ জগতে থাকে। এর থেকে নিষ্কৃতি আমি কিভাবে পাব মা!

মুন্নি নিষ্পলক মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে তার কথা শুনছিল। নিভৃত পল্লীর জীর্ণ কুটিরের অশিক্ষিত বালিকা বধুর মুখ দিয়ে এমন অমৃত তো ঝরতে পারে না! এযে শহরের উচ্চ

রেখে বন্দরের ওয়েটিং রুমে যেয়ে বসলেন তিনি জানেন না কে আসছেন। গত রাতে ঢাকাতে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি আসছেন কিনা, তিনি বলেছেন মালিক কাকে পাঠাবেন জানি না। এতো গোপনীয়তার কি কারণ থাকতে পারে তা আকরাম সাহেবের বুঝে আসে না। পাঁচ কোটি টাকার মাল আটকিয়ে রয়েছে তার সব বুদ্ধি খরচ করেও কাজ উদ্ধার করতে পারলেন না এটা নিয়ে তিনি ভীষণ চিন্তার মধ্যে আছেন। হাশিম সাহেব কি দেশে ফিরেছেন, তিনিই কি আসছেন? তিনি এলে তো ভালই হত কিন্তু তার বোন মুনিরা বেগম যদি এসে যান তাহলে আমার অক্ষমতার জন্যে লজ্জায় তার সামনে মুখ দেখাবো কি করে। দীর্ঘদিন এই অফিসের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছি কিন্তু এমনভাবে পরাজিত হয়নি কোন দিন। তার চিন্তায় ছেদ পড়লো, বিমান এলো। তিনি অস্থির চিত্তে তাকিয়ে আছেন যাত্রীদের নির্গমন পথের দিকে। আকরাম সাহেব চমকে উঠলেন। দেখলেন সাহেবের ছেলে আদেলের হাত ধরে মুনিরা বেগম ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে প্রথমেই মুনিরা জিজ্ঞেস করলো, আকরাম সাহেব কেমন আছেন?

এ প্রশ্নে আকরাম সাহেবের মাথায় যে দুঃশ্চিন্তা জমাট বেঁধে ছিল তার অর্ধেকই অপসারিত হয়ে গেল। নিজের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, অনেক সমস্যার মধ্যে আছি, আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি। কথা শেষ করে আদেলের গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন। মনিরা বললো- চিন্তার কিছু নেই যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমাধানও আছে।

কাতর কণ্ঠে মাথা নিচু করে আকরাম সাহেব বললেন- আমি খুব চেষ্টা করেছি আপা।

চেষ্টা করেছেন পারলেন না এই তো? তা নিজেকে এমন করে অপরাধী ভাবছেন কেন? চলুন গাড়ী কোথায়?

পার্কে।

আকরাম সাহেব তাদের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আগে চললেন। পতেঙ্গায় তাদের অফিস দ্বিতল। নীচের তলায় অফিস আর ম্যানেজার স্বপরিবারে থাকেন। উপরে চারটি থাকবার ঘর একটি খাওয়ার ঘর। ঢাকা থেকে মালিকের পক্ষ থেকে কেউ এলে একটি ব্যবহার করেন। আর তিনটি মালিক এলে থাকেন। প্রত্যেকটার সাথে বাথরুম আছে। রুম তিনটি পরিষ্কার ঝকঝকে। অভিজাত্যের ছাপ লেগে আছে এর ভিতর বাহির সর্বত্র। গাড়ী থেকে নেমেই মুনিরা প্রথমে অফিসের মধ্যে ঢুকলো। সমস্ত কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় হল। সবাইকে অভয় দিয়ে

তোমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে চল বাড়ী যাই। হামিদ দেশে এলে ঢাকায় চলে আসব।

ছেলে মেয়েদের তো সাথে নেওয়া যাবে না মা। তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে। দেখলেন না তাদের নিয়ে আমরা কোথাও যাইনা। কয়েক দিন পরেই আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

ভাই বোনে মিলে ঢাকার কাজগুলো সমাধা করলো। খুলনার সংবাদ নিয়ে তাদের সুবিধা অসুবিধা জেনে নিয়ে তারা কিভাবে এগোবে তার পথ নির্দেশ পাঠালো। খুলনা থাকতে আরও কতকগুলো কাজের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিল মির্জা সাহেবকে। মুনিরা বলেছিল ছোট বেলা এক স্কুল শিক্ষক আমার পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন, আমি চাই তাকে এক উচ্চ পদে চাকুরী দিতে। হাশিমপুর ইউনিয়নের যেখানে পানির অভাব সেখানে পানির ব্যবস্থা করা, গায়ের লোকদের মধ্যে যাদের পায়খানা ঘর নাই সেখানে সেনিটারীর ব্যবস্থা করা। মরহুম আঃ খালেক খান সাহেবের নামে মাদ্রাসা, মসজিদ, হাইস্কুল অন্ততঃ একটি কলেজ দিলারা খানের নামে একটি গার্লস হাইস্কুল আর একটি গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হাশিমপুর হাইস্কুলের শিক্ষক মোঃ আনিছ চৌধুরীর বাড়ী খালিশপুর। আমার পরিচয় গোপন রেখে এই সমস্ত কাজগুলোর দায়িত্ব তাকে দেবেন। হাইস্কুল থেকে যে বেতন পান তার দ্বিগুন বেতন তাকে দেওয়া হবে। মির্জা সাহেব জানালেন- আনিস মিয়া প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না, পরে আমার সাথে দেখা করে সম্মতি জানিয়ে গেছেন। আমি তাকে স্থান নির্বাচন করতে বলেছি। কোন প্রতিষ্ঠান করতে কতটুকু জমি দরকার তার নকশা এবং জমির মূল্য এবং কোথায় কি করতে হবে তার বিবরণসহ আমার সাথে দেখা করতে বলেছি। আপনার কথা মত তাকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছি আর যখনই দরকার হবে তখনই সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছি। অগ্রিম তার এক মাসের বেতন চার হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি। মির্জা সাহেবের কাজের অগ্রগতি মুনিরা সন্তোষ প্রকাশ করলো। তাঁকে খুশী করবার জন্যে তাঁর বেতন আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিল। মরহুম আঃ খালেক খান সাহেবের কাছে মুনিরা এবং তার মা সীমাহীন খুশী। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যেত। তিনি স্বর্গবাসী হয়েছেন। তাঁর আত্মার শান্তির জন্যে যদি জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায় তবুতো মনকে প্রবোধ দেওয়া যাবে। অন্তরে চেপে থাকা একটা অদৃশ্য বোঝা হয়তো নেমে যাবে। মনে প্রশান্তি আসবে, তবেই তো সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে।

পরিশোধ?

আমি জানি না।

তাহলে আমার দীর্ঘ অপেক্ষা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর কি কিছুই নেই? এরপরে আর কিছুর স্পর্ধা আমি রাখি না।

আমি?

সে উত্তর তোমার নিজের কাছে। তবে জেনে নাও আমি কক্ষচ্যুত হইনি। আনন্দের আবেগে হাশিম খান বিদেশী কায়দায় মুনিরাকে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো।

লুসী কৌতুক করে বললো- আমি হারিয়ে গেলাম শূন্য প্রান্তরে। মুনিরা বললো- আমার বন্ধু লুসী সিনহা। হামিদ খান তাকেও আলিঙ্গন দ্বারা শুভেচ্ছা জানালো।

লুসী আরও একবার কৌতুক করে বললো- দুঃখের রজনী চলিয়া গিয়াছে আসিয়াছে সুপ্রভাত। বিরহ বেদনা দূর করিতে চল যাই নিরালায়।

সবাই এক যোগে হেসে উঠলো।

লুসী তাদেরকে নিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। হামিদ খান বললেন দুপুরের পর পরইতো আমার ফ্লাইট। লুসী মুচকি হেসে বললো- শোন বন্ধু শোন, অনেক সাধনার পর তোমারে পেয়েছি কাছে, হারাতে চাইনা আর। সময় এখনও ছয় ঘন্টা বাকী। এই সময়টা কত মূল্যবান স্বর্গের কাননে বিচরণ করে বিরহ বেদনা ভুলিয়ে নাও বন্ধু আমার। তারপর জোড়া বেঁধে যেও তোমাদের বহু আকাঙ্খিত বাসর ঘরে, ধরিয়া রখিব না আর। লুসীর এমন কৌতুকপূর্ণ রসিকতায় মুনিরা আর হামিদ খান পুলক অনুভব করছিল। সমুদ্রের ধারে চারতলা ভবনের উপরের তলায় একটি কক্ষে হামিদ খান বিশ্রামরত। পাশে একটি টেবিলের পাশে দু'টি চেয়ারে লুসী আর মুনিরা বসে আছে। এক সময় হামিদ খান বললো- মুন্নি, একটি জিজ্ঞাসা আমার থেকে গেল। এর উত্তর কি আমি পাব না?

বল।

তুমি কি করে জানতে আমি আজ আসব?

মুনিরার কিছু বলবার আগেই লুসী তার হাত চেপে ধরে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো- অন্তরের গোপন কুঠরীতে সোনার পাখিটি ভালবাসার ভাষাহীন পত্র বিনিময় করে থাকে তাকে তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না বন্ধু। তার কাছেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, সে এর উত্তর দেবে।